দশ কিলোগ্রাম ওজনের গবেষণাযন্ত্র ও ১০ ওয়াট বিদ্যুৎ বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ভারতীয় কর্তারা। ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি ঠিক পথে না চললে বা যথোপযুক্ত নিখুঁত না হলে, পশ্চিমি দুনিয়া এইভাবে এক অর্বাচীন গবেষণাকর্মে যুক্ত হতে চাইত না।

২০০৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময় বিশ্বব্যাপী চন্দ্র-গবেষণার 'স্বর্ণদশক' হতে চলেছে। ভারতের 'চন্দ্রযান-১', জাপানের 'সিলিন', চিনের 'চ্যাঙ-ই' ও ইউরোপের 'স্মার্ট-১' থিতিয়ে পড়া চন্দ্র-গবেষণায় নতুন জোয়ার আনছে। এসব অভিযান মঙ্গলমুখী 'নাসা'র গবেষকদেরও চাঁদের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করেছে। মার্কিন গবেষকরা উদয়পুর অধিবেশনে একথাও স্বীকার করেছেন যে, 'চন্দ্রযান-১'-এর মারফত পাওয়া তথ্য 'নাসা'-র প্রস্তাবিত 'মুনরাইজ ল্যান্ডার'-এর চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ও দক্ষিণ মেরুর পর্যবেক্ষণে সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, 'চন্দ্রযান-১' ভবিষ্যতে প্রথম পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য চন্দ্রযান তৈরিতে ও এক সম্পূর্ণ প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলায় কার্যকরী ভূমিকা নেবে। যাতে ২০২৪ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে চাঁদে যন্ত্রমানব প্রেরণ বা মানববসতি স্থাপনের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে। এবং মাত্র তিনদিনের যাত্রায় যেখানে পৌঁছে যাওয়াটা আর অবিশ্বাস্য মনে হবে না।

সেই হিসাবে ভারতের প্রথম চন্দ্র অভিযান সময়োচিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও যথাযথ। যেমন বলেছেন বিশিষ্ট ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নারলিকার, "এটা একটা মেধার চ্যালেঞ্জ।" এই নিয়ে জলঘোলানো তাই ভিত্তিহীন।

বি | জ্ঞা | ন | ২

বিমান নাথ

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

খবরটা শুনেই আমার স্ত্রী ধুলো ঝাড়ার সরঞ্জাম নিয়ে কাজে নেমে পড়েন আর কি! অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করতে হল যে, প্রথমত, কাজে 'নামার' বদলে রকেটে চড়ে ওপরে উঠতে হবে, আর দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বে সর্বত্র এত ধুলো রয়েছে যে ঝেড়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা বৃথা।

সম্প্রতি NASA-র পাঠানো Spitzer Space Telescope থেকে যে-সব তথ্য বিজ্ঞানীরা জোগাড় করেছেন তাতে জেখা যাচ্ছে মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে রয়েছে ধুলোর রাজত্ব। একেবারে মহাশূন্যে, নক্ষত্র জগতের অপরিসীম শূন্যতায়, যেখানে সবচেয়ে ঘন গ্যাসের ঘনত্বও আমাদের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় কোটি কোটি গুণ কম, সেখানেও ধূলিকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা যে খুব একটা নতুন খবর তা নয়—অনেকদিন ধরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে ধূলিকণা নিয়ে গবেষণা করছেন। তবে ধূলিকণা যে এভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবে সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল।

মহাবিশ্বে ধূলিকণা আমাদের হাটে-মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকা ধুলোর মতোই গ্রাফাইট আর সিলিকেট দিয়ে তৈরি। আকারে মিটারে প্রায় এক কোটি গুণ ছোট। আর সেই কণাগুলিকে খানিকটা উত্তপ্ত করে তোলে আশেপাশের নক্ষত্রের আলো। তবে আমাদের পৃথিবীর ধুলোর তুলনায় অনেক শীতল। এই তাপমাত্রাতে ধূলিকণাগুলি প্রচুর পরিমাণে অবলোহিত (Infrared) রশ্মি বিকিরণ করে। আর এই অবলোহিত রশ্মি নিরীক্ষণ করতেই Spitzer Space Telescope-টি পাঠানো হয়েছিল (সদ্য প্রয়াত জ্যোতির্বিজ্ঞানী Lyman Spitzer এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেছিলেন বলে তাঁর নামে যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে)।

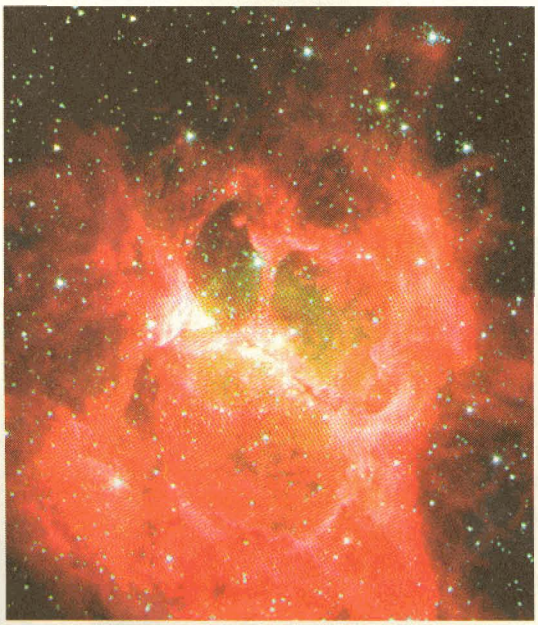

এই পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, মহাবিশ্বের যেসব অঞ্চলে নক্ষত্ররা জন্ম নিচ্ছে সেখানেই বেশির ভাগ ধুলো জমা রয়েছে। নক্ষত্রদের আঁতুড়ঘরেই সবচেয়ে বেশি জঞ্জাল। নক্ষত্র জগতে বোধহয় শুচিবায়ুর কোনও ব্যাপার নেই। বরং বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ধূলিকণারাই নক্ষত্র সৃষ্টির যোগ্য পরিবেশ তৈরি করে। কণাগুলির গায়ে লেগে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরণের অণু—ধূলিকণাগুলিই ঘটকালি করে নানান পরমাণুর মধ্যে মিলন ঘটায়। আর এই নতুন অণুগুলিই নক্ষত্র সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ধুলোবালির জগতে কোন বনধ্ নেই। সবার নজরের আড়ালে আমাদের ঘরে টেবিল-চেয়ারে আর বইয়ের তাকে ধুলো জমে— একের গায়ে আর একটি লেগে 'এত্তা জঞ্জাল' সৃষ্টি করে। মহাবিশ্বেও একই ব্যাপার ঘটেছে। নতুন নক্ষত্রদের চারিদিকে ধুলা জমে এবং কণাগুলি মিলে-মিশে তার চারপাশে নতুন গ্রহ উপগ্রহ তৈরি করে। অর্থাৎ যে সব জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতুর ছড়াছড়ি, যেমন আমাদের এই সৌরমণ্ডল, এইসব এলাকা হল মহাবিশ্বের আর্বজনাস্তূপ। কলকাতার যেমন ধাপার মাঠ। কয়েক সপ্তাহ আগে Spitzer এমনই একটি গ্রহ মণ্ডলের মধ্যে প্রচুর ধুলোর সন্ধান পেয়েছে। গ্রহমণ্ডলটি এখনও তার শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি, আমাদের সৌরমণ্ডলের তুলনায় নেহাৎ অর্বাচীন। দেখা গেছে এই গ্রহমণ্ডলের নক্ষত্রের (আমাদের যেমন সূর্য) চারিদিকে ধূলিকণারা বলয়ের মতো ছড়িয়ে আছে —আর সেই জঞ্জালের মধ্যে যে ছোটখাট গ্রহ তৈরি হচ্ছে তারও পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে।

আরও একটি খবরে বিজ্ঞানীরা চমকে উঠেছেন। কিছু নতুন পর্যবেক্ষণে জানা গেছে যে, শুধু এখনকার মহাবিশ্বে নয়—অর্থাৎ শুধু তার গোধূলিলগ্নে নয়—তার উষাকালেও ধুলোর ছড়াছড়ি ছিল। যখন মহাবিশ্বের বয়স তার বর্তমান বয়সের প্রায় দশভাগের একভাগ ছিল, তখনকার কিছু গ্যালাক্সিতে প্রচুর ধূলিকণার আভাস পাওয়া গেছে। ধূলিকণা তৈরি হতেও তো কিছু সময় লাগে। মহাবিশ্বের জন্মের পর পরেই এত জঞ্জাল কী করে তৈরি হল তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। অনেকের মতে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিদের বির্বতনের সঙ্গে ধুলোবালির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জঞ্জাল জমলেই জন্মায় নক্ষত্র, আর নক্ষত্রের আলোয় গ্যালাক্সির পরিবেশ হয় জমজমাট। ধুলা না জমলেই দেখা যাচ্ছে সব কিছু মাটি।

ভাগ্যিস ধুলো ছিল। ছিল জঞ্জাল। নাহলে পৃথিবীর কথা দূরে থাক, আমাদের সূর্যেরই জন্ম হত না।